OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 28
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 17 - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

অন্নদামঙ্গল কাব্যে নারী পরিসর : একটি সমাজ মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ন

ড. সুস্মিতা ব্যানার্জী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
এস. কে. রায় কলেজ, কাটলীছড়া
Email ID: susbanerjeee1@gmail.com
0009-0009-4181-4020

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
women, society, limitations, struggle, sacrifice, dependent, goddess, values, power.

Abstract

The character of women is presented in a multidimensional manner in Bharat chandra Raygunakar's kavya Annadamangal. Where the role, position, power and limitations of women are all reflected together. Here, women are on the one hand the ideal housewife and chaste woman, and on the other hand the symbol of strength and motherhood. The aspect of women's divinity and power is revealed through the goddess Annada, which indicates the importance of women in society.

In the Annada mangal kavya written by Bharatchandra Raygunakar, women are not only a part of household life, but also play an important role in the progress of the story. In the case of human women, although they are bound by the rules of society and dependent on men, they protect their position through patience, tolerance and intelligence. The kavya depicts their sorrow, sacrifice and struggle, as well as the subtle aspects of conjugal love and family relationships. The goddess Annada is at the center of the Annada mangal kavya. She is not only the goddess of worship, but also a symbol of power. Through her, women are presented as a mother figure on the one hand and a source of power on the other.

Through a discussion of the main story of Bharatchandra's kavya Annadamangal, we will try to understand how the women depicted by Bharatchandra in this kavya has become a mixed reflection of both limitations and power- which clearly highlights the reality and values of medieval society at the same time.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা মঙ্গলকাব্য বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের সময় পর্যন্ত বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কাল। ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তন আর বাঙালির জীবনে ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস। মূলত সেই সময় তুর্কীরা বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 28
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর এই তুর্কী শাসন ব্যবস্থায় বঙ্গদেশে অত্যাচার ও ধর্মান্ধতার মাত্রা বাড়তে থাকে, ফলে নির্যাতিত - বিপর্যস্ত মানুষ এই রাজনৈতিক গোলযোগ থেকে মুক্তি পেতে দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়। ছিন্নমূল মানুষ উপায়ন্তর না পেয়ে দেবতার স্তুতি প্রার্থনা আরম্ভ করে। এই ধরনের স্তুতি প্রার্থনামূলক কাব্যই মঙ্গলকাব্য রূপে খ্যাত। এইসব মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গ কাঠামো অবশ্যই দেবদেবী সম্পর্কিত কিন্তু এর অন্তর্বয়নে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনার এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্রই মঙ্গল কাব্যে প্রতিবিম্বিত রয়েছে। বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, শাসক শক্তির আক্রোশ, ব্রাহ্মণ্যবাদ অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্ন প্রথায় জর্জরিত বঙ্গ নারীর দুঃখ যন্ত্রণার কথাই মঙ্গল কাব্যে ধরা পড়ে, তবে বিশেষ করে সেকালের কয়েকটি বর্বর প্রথার চিত্র বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন - সহমরণ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যগুলো মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাব্য হলেও এর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক একান্তভাবে মানবিক। মঙ্গলকাব্যগুলোতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদাহীনতা, মূল্যবোধহীনতা, প্রাত্যহিক জীবনের মর্মদহনই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যার ফলে নারী চরিত্রগুলি ব্যক্তি পারস্পর্যে সুগঠিত নয় বরং তারা সমাজে অবদমিত ও অপাংক্তেয়, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত বর্গের প্রতিনিধি। স্বার্থান্বেষী মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লোভ লালসার শিকার হতে হয়েছে বাঙালির গৃহবধূদের ফলে অভিশপ্ত জীবনের চরম দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিতে হয়েছে তাদের - কেননা তখন পুরুষতন্ত্রের একাধিপত্যের দ্বারা নির্ধারিত ছিল সমাজ। আমাদের আলোচ্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনির আলোচনার মাধ্যমে এই কাব্যে ভারতচন্দ্রের চিত্রিত নারী কিভাবে একাধারে সীমাবদ্ধতা ও শক্তির মিশ্র প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে — যা মধ্যযুগীয় সমাজের বাস্তবতা ও মূল্যবোধকে একই সঙ্গে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে - তা বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বহুধা বিভক্ত মঙ্গলকাব্যে অন্নদামঙ্গল কাব্যের অবস্থান নিরূপনের জন্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের একটি ছক নিম্নে দেওয়া হল -

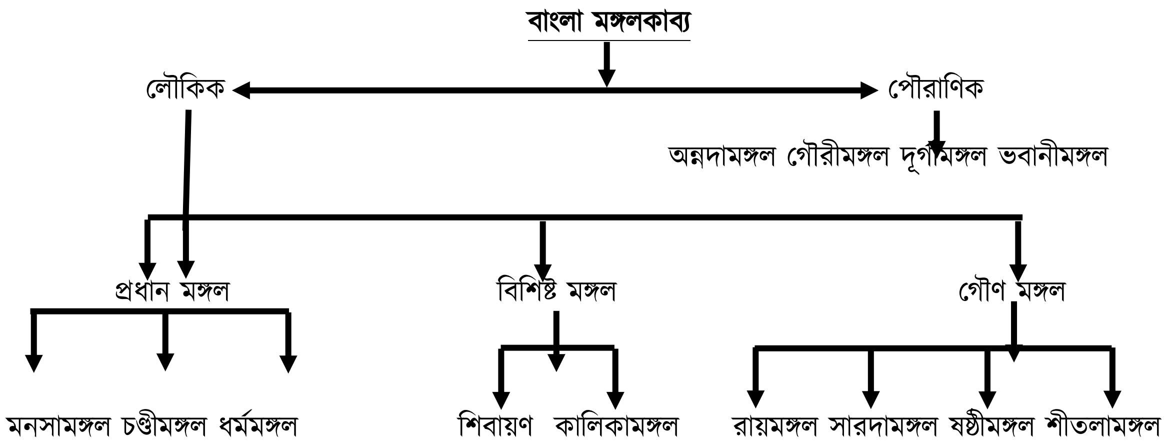

এই ছক অনুসারে দেখতে গেলে পৌরাণিক ভাগে পড়ে অন্নদামঙ্গল কাব্য।

অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার সময়টা হল আঠারো শতক। ইতিহাস তখন বেদনা ভারাক্রান্ত। ষড়যন্ত্র, লালসা, ক্ষমতার লড়াই আর নির্বিচার শোষণে আচ্ছন্ন গোটা শতাব্দী। একদিকে পলাশীর যুদ্ধ, নবাবীর পতন, কোম্পানির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর অন্যদিকে মন্বন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা আর বিপ্লব বিদ্রোহের ক্রমবর্ধিত প্রকোপে বঙ্গভূমির তখন নাভিশ্বাস উর্ধ্বে উঠেছে। সেই সমাসন্ন যুগসংগটের বার্তাই ঘোষিত হয়েছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুযায়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবি গুণাকরকে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য সংগীত রচনা করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তদানুসারে তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাছাড়া সেই সময় তার সামনে ছিল কবি মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল কাব্যের আদর্শ তাই তার কাব্যে সেই আদর্শেরও রূপায়ণ কিছুটা ঘটেছে। শুধু বদলে গেছে যুগ আর বদলে গেছে যুগগত ব্যবধানকে স্বীকৃতি দিতে স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে সর্বপ্রথম দেখা যায় দেব নির্ভর মানবতা। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খন্ডে

অন্নপূর্ণার নামে দেবীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন অন্নদা কিন্তু এখানে দেবীত্বের আবরণে এঁদের ভিতর মানবতারই প্রকাশ ঘটেছে। ভাগবত শক্তির ঊর্ধ্বে মানবতার এই বিকাশের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের যুগাভিসার।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে নারীর ত্রিবিধ রূপ : মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী ভারতচন্দ্রও কাব্যের সূচনা (গীতারম্ভ) করেছেন দেবী চরিত্র সীতাকে দিয়ে ইনিই ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা। গীতারম্ভ অংশে ভারতচন্দ্র অন্নদার যে দেবীর রূপের কথা বলেছেন ইনিই শিববন্দিতা ও শিব প্রতিষ্ঠিত কাশির দেবী অন্নপূর্ণা। তবে বাংলা মঙ্গলকাব্যের চন্ডী বা মঙ্গলচন্ডী দেবীর সঙ্গে অভিন্ন। তিনি কখনও গৌরী, কখনও উমা, কখনও সতী এবং কখনও আবার শংকর গৃহিণী শংকরী। এ সমস্তই পরমা প্রকৃতি আদ্যাদেবীর বিভিন্ন রূপ শংকরাচার্যও তার বিখ্যাত অন্নপূর্ণা স্তোত্রে বলেছেন -

“কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী, উমা, শংকরী,
কৌমারী - নিগমার্থ - গোচরী ওঙ্কারবিজাক্ষরী।”[১]

অন্নপূর্ণা দেবীর রূপ ও স্বভাব মহিমাতে অভিনবত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে অন্নপূর্ণার মূল স্বভাবই হলো প্রসন্ন কৌতুকময়ী দেবী, বিবাদ পরায়ণ, আত্মপ্রতিষ্ঠান্বেষিণী মঙ্গল দেবীর থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি পুরাকাল থেকেই পরমাপ্রকৃতি দেবী হিসেবে পুরানে প্রতিষ্ঠিত, তাই লৌকিক মঙ্গল দেবীর মত দেবী মহলে নিজের স্থান করে নেবার প্রচন্ড উগ্র শক্তির অলৌকিক লীলায় অপর দেবতার সঙ্গে সংঘর্ষে তাকে লিপ্ত হতে হয়নি। বরং মানুষের যথার্থ ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে সেই শুরুর সুতীব্র কঠিন শক্তির দেবী চণ্ডী থেকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র পরিণাম রমনীয়তায় ‘মাতা অন্নপূর্ণারূপে’, ভিখারীর গৃহলক্ষী রূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতা-মাতার কন্যা রূপে – জননী, জায়া, কন্যা – রমনীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে বাঙালির ঘরে ঘরে রসসঞ্চার করেছেন তিনি। তাই অন্যান্য মঙ্গল দেবীর মত নতুন করে আত্ম প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই বলেই এই কাব্যে দেখা যায় কাশীর অন্নপূর্ণা - পুরীর রত্ন প্রতিমায় দেবীর অধিষ্ঠানের জন্য স্বয়ং শিব এবং দেবতাদেরও কঠিন তপস্যা করতে হয়েছিল।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী : পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অনুস্তরে পরিবার থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রের সংসদ পর্যন্ত সর্বত্রই পুরুষের দখলে থাকে বলে সামাজিক–সাংস্কৃতিক–নৈতিক–নান্দনিক-রাজনৈতিক নির্ণায়ক হল এখানে পুরুষ। সে তার শাসক ও শোষকের ক্ষমতায় নিজেকে মনে করে ‘আমিই সর্বেসর্বা’ এবং নারী অপর বা নীচু।

সৃষ্টি থেকে শুরু করে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীরা নারী বলেই নির্যাতিত। তবে একথা সত্য যে আদিম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে নারী পুরুষের মর্যাদা সমভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সামাজিক পরিকাঠামো তথা রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে নারীরা নিদারুণভাবে নিপীড়িত হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে সনৎকুমার নস্করের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, -

> “হিন্দুযুগ পেরিয়ে মুসলমান শাসনামলে মেয়েদের সম্পর্কে শাস্ত্রী সমাজ খুব কঠোর হয়ে ওঠে। ইসলাম ধর্মের আগ্রাসনকে ঠেকাতে গিয়ে আত্মশক্তির অভাবে হিন্দু সমাজ কূপমন্ডুক, রক্ষণশীল, লোকাচারের অন্ধ অনুসারে পরিণত হয়। সতীত্ব রক্ষার অসমর্থ পুরুষপুঙ্গব চালু করে অনাবশ্যক পর্দাপ্রথা। রক্তসংমিশ্রণ বোধের জন্য তার যাবতীয় বিধি- বিধান নারীকেন্দ্রিক হয়ে পড়লে মেয়েরা গৃহবন্দী সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। এই সময় পর্বেই গড়ে ওঠে সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির মতো অনেকগুলি অমানবিক প্রথা। একালে স্বাধীন মত ও ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না স্বৈরাচারী পুরুষের কাছে। আর এই অধীনতাকে অমোঘ ভবিতব্য বলে নারীর কপালে সেঁটে দিতে পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলিও কম সহায়তা করেনি।”[২]

সেই সময় পুরুষই ছিল সর্বেসর্বা অর্থাৎ রাজ্যিক ক্ষেত্রেও ছিল শুধু পুরুষের অধিকার এতে নারীর কোন স্থান নেই। কারণ নারীরা ছিল তখন পিঞ্জিরাবদ্ধ বিহঙ্গের মতো প্রাচীরে ঘিরা গৃহকোণে বন্দী। এজন্য নারীরা রাজনীতির সংস্পর্শ লাভ করতে পারেনি। আর সেজন্যই তারা পুরুষের ঐকান্তিক প্রতাপের অনুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। বরং সেই প্রতাপের দাবানলে তারা দগ্ধ ও নিষ্পেষিত হয়েছে। আসলে সমাজ তখন নারীকে ঊনমানব ভাবত অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মানুষ

নয়। সমাজে নারীকে সাধারণত জায়া, জননী এবং কন্যা এই তিনরূপেই ভূষিত করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদারও এই তিনরূপের পরিচয় পাই আমরা।

তখনকার সময়ে কৌলীন্য প্রথা নামে একটি বর্বর প্রথা নারীর জীবনের অভিশপ্ত ছিল। এই কৌলীন্য প্রথার ফলে আশি-নব্বই বছরের বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বালিকার বিবাহ হত। মঙ্গল কাব্যগুলোতে যে নারী জীবনের চিত্র পাওয়া যায় তা একান্তই তাদের রিক্ত ও নিঃসহৃদয়ের পরিচায়ক। কৌলীন্য প্রথা শাসিত সমাজে বহুবিবাহের নিদারুণ অভিশাপ ছিল। তাই সতীনসহ ঘর করার অসহনীয় জ্বালা ভোগ করতে হত কুলীন ঘরের স্ত্রীদের। সৎ সম্পর্কের যে উদাহরণ ছিল না তা নয় তবে তা ব্যতিক্রম। বাস্তবে ছিল এই ভাবনা, -

"সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার।"[৩]

তেমনি সতিনী ঘরে আনার যন্ত্রণা যে কী মর্মান্তিক তা বুঝেছে হরিহোড় সোহাগীকে বিবাহ করে। তবে আধ্যাত্মিক অর্থে গঙ্গা ও উমার মধ্যে কোন বিরোধ হয়তো নেই, কিন্তু ঈশ্বরী পাটুনীর মতো সুজন ব্যক্তির মনেও কৌলীন্য প্রথা ও কুলীন ঘরের রীতি-নীতি সম্পর্কে বিরাগ জন্মেছে, তাই দেবীর আত্মপরিচয় শুনে বলে,

"পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনি সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।।"[৪]

অর্থাৎ এহেন কুলীন-অকুলীনভেদের প্রশ্ন ও বাহুল্য হয়ে যেত কাঞ্চন কৌলিন্যের প্রতাপে। তাই ধনধান্যে পরিপূর্ণ 'কুবেরসোঁসুর' হরিহোড় যখন 'নানা মতে ধন দিয়া সকলে তুষিল' তখন -

"বাহাওরে গালি ছিল তাহা গেল দূর" এবং
"ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলিনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিনরূপে গুণে ধন্যা।"[৫]

সেসময় কৌলীন্য প্রথার কারণে বিয়ের পাত্রদের যথেষ্ট বয়স হত। আর এই বৃদ্ধ পাত্ররা পুনরায় বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাত। ফলে অল্পবয়সীরা সমাজের নির্মম প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হত। শিব চরিত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র সমাজের এই ঘৃণিত প্রথাকে তুলে ধরেছেন যার বলি হয়েছে স্বয়ং গৌরী। তাছাড়া সে সময়ে কৌলীন্য প্রথার বার বাড়ন্তের পাশাপাশি ছিল পুরুষের বহুচারিতা ও যৌন শিথিলতার আধিক্য, তা পার্বতী - পরমেশ্বরের যুগল রূপ ও নলকুবর ধনে মত্ত হয়ে নানা যুবতীর সঙ্গে কামবিহারে রত ইত্যাদি ঘটনাকে আশ্রয় করে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজকে অনাবৃত করেছেন।

ভারতচন্দ্র 'শিব বিবাহ' বর্ণনায় এই কৌলীন্য বিধিসম্মত শিষ্টাচারের কথা বলেছেন।

"উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্র কথা কহে ধীরগণ।"[৬]

এমনকি বরের জাতি গোত্র প্রবর ইত্যাদির উল্লেখও বাদ পড়েনি ব্রহ্মার শ্লেষার্থপূর্ণ উক্তিতে,

"স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর
শিবগোত্র শম্ভু শর্বশঙ্কর প্রবর।।
এ রূপে গিরিশে গৌরী দান দিলা।"[৭]

কন্যাকে গৌরীদান করার সেকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উমার বিবাহ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। এভাবে কন্যাদায়গ্রস্থ একটি কুলীন পরিবারের রমণী গৌরী দানের সময় বৃদ্ধ অকর্মণ্য জামাইকে সাশ্রুনেত্রে এই অনুরোধটুকুই করেছিল, "আটু ঢাক্যা বস্ত্র দিহ পেট ভর্‍্যা ভাত।"[৮] তবে দীর্ঘ এত বছরের ব্যবধানে এখন বরং ভারতচন্দ্রের পার্বতীর দুর্দশা আরও চরমে পৌঁছেছে। সমাজের এ চিত্র থেকেই বোঝা যায় যে সে সময়ে নারীর বাস্তব পরিস্থিতি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতে সব কিছু মঙ্গল-অমঙ্গল এর দায়ভার শুধু নারীকেই বহন করতে হয়। তাই সুগৃহিণীপণায় অতি দরিদ্রের ঘরও যেন কোনদিন স্নিগ্ধ - শ্রী ও মমতার উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠতে পারে তাঁর সংশয়হীন পরিচয়ও কবি দিয়েছেন। যেখানে দারিদ্র পীড়িত

ঘরে বৃদ্ধ প্রতি সিদ্ধি খেয়ে বেড়ায়, সংসার চালানোর জন্য কাজকর্ম করে না এমতাবস্থায়ও বলা হয় নাকি ঘরের বধু স্নিগ্ধ-শ্রী হলে ঘর ধনধান্যে আনন্দে ভরে উঠতে পারে।

এ কাব্যে ভারতচন্দ্র গঙ্গা চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন তৎকালীন বাঙালির আদর্শ বধূরূপে। যে বধূর স্বামী যাই হোক না কেন সে কিন্তু স্বামীর গর্বে গরবিনী। তাই শিব পত্নী গঙ্গা যখন ব্যাসের স্তুতির প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন তখন স্বামীর গর্বে গরবিনী স্ত্রীর মতোই তিনি জানিয়েছেন, -

“যাহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম।।”[৯]

বলে ব্যাসকে নির্দেশ দিয়েছেন, -

পুনঃ না নিন্দিহ আমার কাছে।
যে শুনে তাহার পাতক আছে।
জানেন সকল শংকর স্বামী।
এসব কথায় না থাকি আমি।।”[১০]

এ সকল বিবরণ থেকে এটাই বোঝে নিতে হবে যে তখন পর্যন্ত সমাজ নারীকে ভাববার অবকাশ দেয়নি। সমাজে নারী ও পুরুষের সমান ভিত না থাকায় নারী ক্রমশ শোষিত - বঞ্চিত হতে থাকে। পুরুষের হাতে থাকত প্রতাপের কৃৎ কৌশল। তাই এভাবেই পুরুষের গড়া সমাজের কারাগার পৃষ্ঠে চাপা থাকত নারীর অস্তিত্ব। আর ক্রমশ তারা নিজেকে অবলা বলে জাহির করে এবং নিজেকে শাশ্বতী ও পতিব্রতা করার মধ্যে দিয়ে পিতৃতন্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে।

পরুষ সর্বস্ব জগতে নারীরা, সর্বদা পরমুখাপেক্ষী ও তাদের কোন মূল্যবোধ বা পরিসর নেই। বস্তুত তারাই সবসময় মঙ্গল - অমঙ্গলের সমস্ত দায়ভার বহন করে কিন্তু পুরুষের বেলায় কোন দোষই নেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় হর-গৌরীর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের কলহপূর্ণ আলাপচারিতা থেকে। যেখানে গৃহকর্তা শিব কিছু করেন না কিন্তু তিনি জানেন যে, “স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।”[১১] অর্থাৎ পুরুষ অর্থে তার নিজের ভাগ্যে দুটি পুত্র সন্তানের পিতা হয়েছেন কিন্তু স্ত্রী ভাগ্যে ধন পাননি বলে অভিযোগ করার উত্তরে গৌরী বলেছেন যে তারও বলার অনেক কিছু আছে কিন্তু তা বলবেন না কারণ ব্যাপারটি অন্য রূপ নেবে। কারণ সে সময়ের নিয়ম অনুসারে বাঙালি স্ত্রীর তার স্বামীর কথার উত্তরে কিছু বলার অনুমতি ছিল না - এরকমই ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম।

তখন সমাজে সাধারণত নারীকে জায়া - জননী - কন্যা এ তিন রূপেই ভূষিত করা হত এবং বলা হত নাকি নারীর কোন নিজস্ব বাসস্থান নেই। নারীকে শিশুকালে পিতার অধীনে, যৌবনের স্বামীর ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকতে হয়। হরগৌরীর কোন্দলে যখন গৌরী তার বাপের বাড়ি চলে যেতে চায় তখন সখী জয়ার পরামর্শের কথা শুনে বুঝা যায় যে নারীদের জন্মদাতা নিজ ঘরেই বিয়ের পর নিজস্ব স্থান থাকে না। সখী জয়া গৌরীকে বলে যে ক্রোধের বসে বাপের বাড়ি যাবে একি ছাবাল খেলা শুরু করেছ। পিতৃ গৃহে বেশি দিন থাকলে সম্মান পাবে না প্রথমত ভাইয়ের বৌ ব্যাপারটা ভালোভাবে মেনে নেয় না। এমনকি বাবা-মাও একসময় নিস্পৃহ হয়ে যায়। গৌরীর সমব্যাথী সখী হিসেবে পিতৃগৃহে গমনোদ্যত গৌরীকে তাই নিষেধ করেন বাপের বাড়ি যেতে -

“জননীর আসে যাবে পিতৃবাসে,
ভাজে দিবে সাদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।।”[১২]

তাছাড়া ভারতচন্দ্রের কবিকৃতির অসামান্যতা কতদূর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল অন্নদামঙ্গল কাব্যের অজস্র প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডার। প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে দিয়ে সে সময়ের নারীর যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নেওয়া যায়। নিম্নে তার মধ্যে থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরা হল। যেমন -

১. গৃহিণীর পাপে - পুণ্যে ঘর থাকে মজে।

২. বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মতো পাইয়াছি চণ্ডী।।
৩. সতীন হইলে পতি বড়ই প্রহার।
৪. নারী যার স্বতন্ত্ররা, সে জন জিয়ন্তে মরা।
৫. জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে যায় পুত্র বাপে দিলে তাড়া।।
৬. বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে।
৭. কিবা শুভক্ষণে হইল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর।।
৮. রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।
৯. স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।
১০. একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এলো এবার হলা আস্তাকুঁড়ের কুকুর।।
১১. মেয়েরা কি কুলে জন্মে না পায় সম্মান। ইত্যাদি

তাছাড়াও সেসময় সতীন সমস্যা খুব বেশি প্রচলিত ছিল তাই বসুন্ধরা যখন দেবী অন্নদাকে তার দুখের কথা বলেন তখন তার কথার মধ্যে দিয়েও সতীন সমস্যার একটি রূপ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়।

"আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া
আনন্দে রাখিয়া তারে তিন নারী দিয়া।।
স্বামীহীন আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া।।"[১৩]

অন্নদামঙ্গল কাব্যে হরিহোড় সোহাগীর সহমরণ ও শিবগৌরীর দাম্পত্য জীবনের শুরুতে শিবের অর্ধনারীশ্বর হওয়ার প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় দেবীর করা উক্তির মধ্যে দিয়েও যেন কবি আমাদের সচেতন করে দেন যে অষ্টাদশ শতকেও সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। আসলে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটুনী ও দেবীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি নারী জীবনের যন্ত্রণার কথা বয়ান করেছেন। দেবীর ভবানন্দ ভবনে যাবার সময়ে আমরা প্রথম ঈশ্বরী পাটুনীর সাক্ষাৎ পাই। সে দেবীকে নদী পার করে দেবে। তখন নির্জন খেয়া ঘাটে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবীকে দেখে ঈশ্বরী পাটুনীর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর কল্পিত বর্ণনা দিয়েছেন -

> "সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকিনী 'কুলযামিনী – গৃহত্যাগিনী কী? কেন? অপকর্মের উদ্ধত বা ভীত পদক্ষেপ তো নয়। দেখলেই কেমন ভালো লাগে? যেন ভক্তি হয়, মা বলতে ইচ্ছে করে, পরের ঘরে চলে যাওয়া নিজের লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মেয়েটির কথা মনে পড়ে। অব্যক্ত ব্যাথায় পাটুনীর বুক টনটন করে ওঠে, সে আনমনা হয়ে পড়ে। আহা, না জানি শ্বশুর বাড়িতে সে কেমন আছে? এই মেয়েটিও নিশ্চয় যন্ত্রনা সইতে না পেরে গৃহ ত্যাগ করেছে। ... পাটুনীর কষ্টবোধ হতে থাকে। পাটুনী আবার চিন্তিত ও হয় - মেয়েটিকে দেখে তো বড় ঘরের বউ মনে হচ্ছে।"[১৪]

এরূপ চিন্তা থেকে যাতে কোনরকম ঝামেলায় পড়তে না হয় তাই পাটুনী দেবীর পরিচয় জানতে চায়। শংকরীপ্রসাদের এরূপ ভাবনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি সে সময়ে শ্বশুর ঘরের মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে নারী ব্যক্তিত্ব : সাহিত্য মাত্রেই জীবনসম্মত এবং জীবন নির্ভর শিল্প। বিশেষ করে দেশ-কাল ও তার অধীনের মানুষকে নিয়েই সাহিত্যের উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে একজন সাহিত্যিকের মানসিকতার গড়ন সমাজ বহির্ভূত হতে পারে না। সমকালীন সমাজ বাস্তবতা সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই। আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিব পার্বতীর সাংসারিক জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবন যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের ধারায়

কবি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করলেও তার রচিত কাব্যে একটি অন্য সুর পাঠকের মনের তন্ত্রীতে বেজে ওঠে। কারণ মধ্যযুগীয় সাহিত্য মূলত দেবনির্ভর মানবতারই প্রকাশ কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যই সর্বপ্রথম দেখা গেল দেব বিনির্ভর মানবতা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো যদিও তার কাব্যে নারীর লাঞ্ছনা, অবদ মনের - যন্ত্রণার সুর পাওয়া যায় তথাপি তার কাব্যেই প্রথম নারীর কণ্ঠে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ঝলক পাওয়া যায়, দাম্পত্য জীবনের শুরুতে শিবের অর্ধনারীশ্বর হওয়ার প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় দেবীর উক্তির মধ্যে দিয়ে -

"হাসিয়া কহেন দেবী এমনও কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।
পুরুষেরা দেখে যদি নারী মরে যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।।"[১৫]

এখানেই দেবী থামলেন না মোক্ষম আঘাতটি এবার হানলেন।

"অর্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ি তবে কেমনে যাইবা।।"[১৬]

এখানে দেবী কি নারীবাদী হয়ে গেলেন? না ইনি দেবী নন - মধ্যযুগের এক বিশেষ কালের গৃহবধূ, যিনি স্বামীর প্রতি, পুরুষ সমাজের প্রতি নারী যে অব্যক্ত অভিমান পুষে রাখে ভারতচন্দ্র তাকেই অন্নদারূপী গৃহবধুর মুখের ভাষায় স্থান দিয়েছেন, আর তাতেই তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে সে যুগের নারীর সামাজিক বৈষম্যের দিকটি। আসলে ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল কাব্য লেখেন তখন মধ্যযুগের প্রায় সমাপ্তকাল এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল। তাছাড়াও রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র রাজ-ভূস্বামীদের স্ত্রীর মুখের কথাকে দেবী অন্নদার মুখে বসিয়েছেন কৌতুকের ছলে। শিব পার্বতীর সম্পর্কের এই ভাষ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে কখনও শোনা যায়নি। নারীর এই কণ্ঠ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উন্মেষকেই চিহ্নিত করে। সামন্ততান্ত্রিক নারীর ব্যক্তি সত্তাকে মূল্য দেয় না, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে সামন্ততান্ত্রিক বজায় থাকলেও বাণিজ্যের প্রসারের কারণে বৃত্তিজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল ফলত ব্যক্তি চেতনাও বাড়ছিল। মানুষ এখন আর শ্রেণি হিসেবে বিচার্য নয় ব্যক্তি হিসেবে বিচার্য আর তাই অষ্টাদশ শতকের নারী হিসেবে গৌরী একইসঙ্গে শিবকে ও পাঠক সমাজকে নিজের অবস্থানটি চিনিয়ে দিয়েছেন।

অন্নদামঙ্গল কাব্য : সমাজমনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ন : ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে সমাজ মনস্তত্ত্বের অর্থ হল যে তথ্য প্রয়োগ করে একটি রচনার মধ্যে দিয়ে লেখকের মানসিক গঠনের সন্ধান পাওয়া যায় অর্থাৎ সামাজিক মানুষকে সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশের স্থিত রেখেই তার মনের গহনকে প্রকাশ করা। ভারতচন্দ্রও তার জীবনকে দেখেছেন প্রত্যক্ষ রূপে। ভারতচন্দ্র হলেন অষ্টাদশ শতকের কবি। বহু বিপন্নতার মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন যাপন করেছেন। তাছাড়াও তিনি তার কাব্য যখন রচনা করেছিলেন তখন ছিল রাষ্ট্রীয় এক অন্ধকার সময়, বিদেশি ইংরেজদের হাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাবার প্রাক্কাল অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের কয়েক বছর আগের সময়। তার জন্য সেই সময়ের দারিদ্র, বঞ্চনা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভক্তি ও দৈব মহিমা উভয়েই মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় সংশ্লিষ্ট দার্শনিক জিজ্ঞাসা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তাই সর্বোপরি দেখা গেল জীবনের পরম দেবতাকে প্রণাম জানাবার সময়ও কবি ভগবানকেও মানবিক ন্যায়-অন্যায় বোধের অধীনে করে জেনেছেন এবং গভীর আর্তিতে উচ্চারণ করেছেন -

"নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্যনহে ভাল তাহা,
আমি যা খেলিতে চাহি, সে খেলা খেলাও হে।।"[১৭]

তেমনি অভিশাপে নিষ্ফল ব্যাসদেবের মুখেও বেদনার্ত কঠিন প্রশ্ন শুনিয়েছেন -

"শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কিগুন বাড়িল তবে ব্যাসেরে ছলিয়া।।"[১৮]

মানসিক এই পরিবর্তনের কারণই হল ভারতচন্দ্র তাঁর বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন সন্ধিকালের সমস্ত সংঘাতকে। সন্ধান করেছেন নতুন জীবন দর্শন এবং নতুন মানবিক জীবনাদর্শ। তিনি মঙ্গলকাব্যের বিষয় ও কাঠামো গ্রহণ করলেও ভারতচন্দ্র ছিলেন নতুন জীবন রসের ও বিচারশীল মননের কবি। ফলে দেবতাদের স্থাপিত করেছেন মানব চরিত্র বিশ্লেষণী আতস কাঁচের আলোর সামনে, একই সঙ্গে মেলে ধরেছেন দেব চরিত্রের মহিমা ও অপগুন দুই-ই।

রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে এঁকেছেন নগর জীবনের ছবি। এই ছবি প্রধানত বিদ্যাসুন্দর এবং মানসিংহ-ভবানন্দ অংশে পূর্ণভাবে থাকলেও মূল অন্নদামঙ্গলের প্রথম খন্ডেও প্রাধান্য পেয়েছে আভিজাত চৈতন্য সাধনার উচ্চতর সমাজ ও দেবসমাজ। হরিহোড়ের কাহিনি বাদ দিলেও সমস্ত কাহিনি যেন মানুষের ধর্মীয় চৈতন্য সাধনার আনুপূর্বিক দ্যোতনা বহন করে। অন্নদামঙ্গল তাই সাধারণ সমাজের সহানুভূতিময় বাস্তবচিত্র মাত্র নয় এই কাব্য হল ধর্মীয় সমাজের ধর্ম সাধনার নানা সংঘাত ও সমন্বয়ের কথা। সমাজ প্রগতির আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি কিভাবে কাজ করেছিল তৎকালীন সময়-পরিবেশে – ভারতচন্দ্র যেন তারই পরিচয় দিতে চেয়েছেন এই কাব্যে।

সেই সময় বাংলার আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। জমিদারের উপর বাড়তি করের বোঝা শেষ পর্যন্ত প্রজাদেরই বইতে হত। কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের পূর্ববর্তী তিনজনও কর না দিতে পারায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম নন। আসলে জমিদাররা যেহেতু অন্ন অনুৎপাদক শ্রেণির তাই শেষ পর্যন্ত প্রজাদের উৎপাদন শোষণ করেই রাজস্ব প্রদান করতে হত। আর এই অনুৎপাদক শ্রেণির শোষণের কারণে প্রজাদের দারিদ্র্যতা। তার ছবি ভারতচন্দ্র শিব চরিত্রের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। ভিখারি শিব অন্নের সংস্থান করতে পারে না বলে পরিবার পালনে অক্ষম শিব তখন কিন্তু সমস্ত দোষ অন্নদার উপর চাপাতে চান। শিব গৃহিনীও আক্ষেপ করে স্বামীর অকর্মণ্যতায়-তিনি বাপের বাড়ি চলে যেতে চান। এসবই রূপকের আড়াল। আসল বাস্তবটি প্রকাশিত হয়, জয়ার উপদেশ অংশে। অন্নপূর্ণাকে জয়া উপদেশ দিচ্ছে অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করে কটাক্ষ করিয়া তিনভুমণ্ডলের যত অন্ন আছে তা 'হরিয়া' নিজের কাছে রাখার জন্য। এখানে অন্নপূর্ণার মধ্যে আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রের ছায়া দেখা যাচ্ছে। তিন ভূমণ্ডলের সমস্ত অন্ন হরণ করার কারণেই তো তিন ভুবনের মানুষ (শিবসহ) অন্নহীন। বাস্তবে নবাব-ইজারদার-জমিদারদের শোষণের কারণে প্রজারা অন্নহীন। 'অন্নদার' রূপকে সেই বাস্তবের ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করিয়েই কবি সমস্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন।

আর এই আধুনিক দৃষ্টিকোণে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে সমাজ। এই আর্থিক বুনিয়াদের পরিবর্তন ঘটলে সমাজ বদলে যায়, আর বদলে যায় সমাজের মূল্যবোধ। তখনই বিশ্বাসের পরিবর্তে সংশয়ের চিহ্ন দেখা যায় সামাজিক মনে। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীকে তাই 'Age Interrogation' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই অষ্টাদশ শতকের সমাজ জীবনে দুটি চিত্র ধরা পরে, একটি হল একদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার আর অন্যদিকে নাগরিক জীবন ও তার নীতিহীন অবক্ষয়ের ছবি। গণতন্ত্রের উল্লাস তখন অনেক দূরে, সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও রুচিবিকার একই সঙ্গে আঠারো শতকের সমাজের তখনও বিদ্যমান। ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধি স্থানীয় কাব্য। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অধ্যায়ের একটি সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি এখানে ধরা পড়ে। শিব পার্বতীর সাংসারিক জীবনযাত্রায় ধরা পড়েছে সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবন যাপনের ছবি। যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে বিশৃঙ্খল সংসার জীবনের নানা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। শিবকে যেখানে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়, অন্নের জোগাড়ে অন্নপূর্ণাকে দেখা যাচ্ছে চৌর্যবৃত্তিতে রত হতে - ত্রিভুবনের সমস্ত অন্ন তাঁর ভাড়ারে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আধুনিক কালের মত মজুদারের অস্তিত্ব সেযুগেও ছিল। তাছাড়াও ঈশ্বরী পাটুনীর বর প্রার্থনাও সে যুগের সমাজের ছবি হিসেবেই গণ্য।

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।"[১৯]

এই বর কামনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন আসন্ন দারিদ্র্যপূর্ণ সমাজকেই চিহ্নিত করেছে।

ভারতচন্দ্রের আধ্যাত্মিক চেতনার মর্মকেন্দ্রেও ছিল মানুষ আর সেই মানুষ কেবল দৈব নিগৃহীত অথবা কেবল দৈব কৃপাপুষ্ট নয়, নানা বিরোধী দোষে-গুণে পূর্ণ সেই মানবিক সত্তায় ভারতচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন বাস্তব জগৎ সংসারের অকরুণ সংগ্রামের চিহ্নগুলিকে। তাই দেবচরিত্রও কবির কাব্যে মানব নিয়তির অধীন হয়ে দেখা দিয়েছে। শিব যিনি দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি সমগ্র বিশ্বের পরমেশ্বর যিনি স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপ, তাঁকেও দেখতে পাই নিতান্ত সাধারণ নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের মতই অন্নপ্রার্থী। নিদারুণ পরিহাসময় প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে তাই, -

“আর আর দিন তাহে হোসেন গোঁসাই।
ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই।।
চেতরে চেতরে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ।।
যেজন চেতনামূখী সেই সদা সুখী।
যেজন অচেত চিত্ত সেই সদা সুখী।।
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব।।”[২০]

নিজেকে নিজেই খণ্ডন করার এমন পরিহাসময় কঠিন দৃষ্টান্ত আর মেলে না কোথাও। ভারতচন্দ্রের চোখে মানব নিয়তি যেন নিত্য দূর্দৈবের দ্বারা বেষ্টিত। এ কারণেই দেবী অন্নপূর্ণাও নরলোকে নিজ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য যে মানবীটিকে নিমিত্ত করেছিলেন তার জীবনেও নিয়তির অতি কঠিন পরিহাসের অসহনীয় জ্বালা। অন্নহীন - বস্ত্রহীন - অস্থিচর্মসার সেই নারীর,

“লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।।
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্মসার।
গেয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার।।
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি।।”[২১]

অষ্টাদশ শতকের নাগরিক জীবনের আপাত বৈভবের আড়ালে এটাই ছিল তৎকালীন বাংলার বাস্তব আর্থিকচিত্র। আসলে ভারতচন্দ্রের কাব্যে রয়েছে সমাজজীবনের তত্ত্ব। তাই রাজসভার আত্মসচেতন কবি অত্যন্ত তীব্র সংবেদনশীলতায় উপলব্ধি করেছেন সমকালীন সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অসহনীয় যন্ত্রণাকে এবং সেই দুঃখ কষ্টের ছবি এঁকেছেন মর্মান্তিক রেখার টানে অতিশয় চড়াসুরে।

এছাড়াও সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের নগ্ন রুচিহীনতার যে প্রকাশ দেখা যায় তার বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি তাঁর কাব্যে। রাজ দরবারের রুচিহীনতার নগ্নতা, কামনা – বিলাস, নীতিহীন জীবন - জনজীবনে ভালভাবে প্রভাব ফেলেছিল। অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত নলকূবরের কাহিনি তারই নিদর্শন। যেখানে দেখা যায় নলকূবর অন্নদার পূজা না করে রমনী সম্ভোগে মত্ত, এছাড়াও নারীগণের পতি নিন্দা অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোটা সমাজটাই উঠে এসেছে কবির লেখনীতে। এই পতিতালয়ে যাওয়া সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষজন কেউ কেউ আবার রাজার সভাসদও। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন অংশে তাদের চরিত্র অনাবৃত করেছেন তাদের পত্নীদের জবানিতে নিন্দার ছলে। নারীগণের প্রতি নিন্দার মধ্যে দিয়ে বৃত্তির বৃত্তিজনিত সংকটের চেহারা কবি যেমন দেখালেন তেমনি এই শতকের নারীদের সামাজিক অবস্থানটিও স্পষ্ট করলেন। এখানে হীরার কুট্টনি বৃত্তির কথাও স্মরণে আসে। অর্থের বিনিময়ে হীরার কুট্টনি বৃত্তিকে বেছে নেওয়ার কারণ অবশ্য জীবনধারণের অনিবার্যতায়। তাই বৃত্তিগত সংকটের চেহারা ভারতচন্দ্রের কাব্যে বরাবর উঠে এসেছে। কারণ সমাজের বাতাবরণটি তখন এরকমই ছিল।

পরিবর্তিত যুগ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি মানুষের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় সে কারণেই অষ্টাদশ শতকের সমাজও যে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে তা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিমানসের পরিবর্তনকে চিহ্নিত

করেছে। তাই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধারায় রচনা করেছেন এ কথা মেনে নিলেও তার রচিত কাব্য পাঠকের মনে যেন এক অন্য ইঙ্গিত-ই দেয়। হয়তো তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন এ বিষয়ে তাই অন্নপূর্ণার বন্দনা অংশে কবি নিজেই পাঠকদের জানিয়ে দিলেন, -

"নতুন মঙ্গল আশে/ ভারত সরস ভাষে/ রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের আজ্ঞায়।"[২২]

মঙ্গলকাব্যের প্রথা স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করা - এ প্রথাটি ভারতচন্দ্রও মেনেছেন তবে একটু অন্যভাবে। দেবী কবিকে স্বপ্নে দেখা দিলেন পরলোকগতা নিজের মায়ের রূপে, দেবীর স্বপ্নে দেখা দেওয়ার মধ্যে অলৌকিকতা থাকলেও নিজের মাকে স্বপ্নে দেখা খুবই স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর অলৌকিকতা ছেড়ে বাস্তবকে গ্রহণ করতে উদগ্রীব তা কবির নতুন পরিকল্পনার অভিনবত্বে স্পষ্ট হয়। আসলে সপ্তদশ শতক অপেক্ষা অষ্টাদশ শতকের সমাজ জীবনে যে একটা পালা বদল হয়েছিল তারই প্রমাণ এ কাব্যটি। তাইতো ধর্ম তখনও মানুষের আশ্রয় হলেও কোথাও যেন একটা সংশয়ের ছায়া দেখা দিয়েছিল। বস্তুত দেবতার দয়ার ওপর মানুষ সম্ভবত তখন আর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেন না এরকম দ্বিধা সংশয় ও আত্মসমীক্ষাজনিত মনের নির্মোহ বাস্তব ছবিই চিত্রিত করেছেন ভারতচন্দ্র তাঁর এই কাব্যে।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি - রাজসভার বিলাস - বৈভব, জীবন সম্ভোগের নানা উপকরণ, প্রাচুর্য, চোখ-ধাঁধানো আলোকজ্জ্বল পরিবেশে তাঁকে কাব্য রচনা করতে হয়েছিল ফলে সেই পরিবেশের অন্তঃসারশূন্যতা যেমন তাঁর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি সমাজের অন্য প্রান্তের ছবিও তাঁর রচনায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুত অষ্টাদশ শতকও তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়েই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্য সর্বার্থেই সমাজের দর্পণ - যেখানে শুধুই চলমান মানুষের শোভাযাত্রা।

উপসংহার : সাহিত্য হল সমাজেরই দর্পণ। তাই দেশ কাল ও তার অধীনে থাকা মানুষকে নিয়েই সাহিত্যের উদ্ভব। আসলে প্রত্যেক মানুষই সমাজবদ্ধ জীব এবং মানুষের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি সাহিত্য আকরণ তথা সাহিত্য নির্বাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তাই বলা যায়, সমাজ ও সাহিত্য ওতপ্রতোভাবে জড়িত। ফলত অষ্টাদশ শতকের বৃহত্তর সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ প্রতিনিধি হলেন ভারতচন্দ্র। তিনি যুগপ্রতিনিধি কারণ তমসাচ্ছন্ন একটি কাল তার সামাজিক – অর্থনৈতিক - ধর্মীয় মুখোশকে উপড়ে স্ব-রূপে তুলে ধরেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে। তিনি রাজসভার কবি। সামন্ত দরবার আর অন্তঃপুরের ভিতর আর বাহির, ঐশ্বর্য আর দীপ্তির পাশে আত্মম্ভরিতা আর লালসা, একনিষ্ঠ ভক্তি আর দৈবী- বিশ্বাসের আপাত প্রলেপের গহ্বরে আস্থাহীনতার নিভৃত বিবর্তন তার কাছে বড় স্পষ্ট। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই কাব্যে। ভারতচন্দ্র তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত কাঠামোকে মেনে নিয়েও আধুনিক ভাবনাকে অনুপ্রবিষ্ট করেছেন। তাই দেখা যায় অন্নদামঙ্গল কাব্যের ভণিতায় বহুবার ভারতচন্দ্র কাব্যটিকে 'নতুন মঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। কবি ভণিতায় ভারতচন্দ্র যে রাজ অনুজ্ঞার কথা লিখেছেন তা হল, -

"নতুন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের আজ্ঞায়।"[২৩]

এই নতুন বলে অভিহিত করার কারণ হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ যে অলৌকিকতার নির্মোক ছেড়ে বাস্তবকে গ্রহণ করতে উদ্গ্রীব তা কবির নতুন পরিকল্পনার অভিনবত্বে স্পষ্ট। তার কাব্যেই প্রথম দেখা যায় মঙ্গলকাব্যের গোষ্ঠী জীবন থেকে বেড়িয়ে ব্যক্তিজীবনের প্রকাশ। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক আবর্ত, সামাজিক অস্থিরতা মানুষের জীবনকে অনিকেত করে তুললেও গোষ্ঠী জীবন বজায় থাকল না। গোষ্ঠী ভেঙে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করল। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই অস্থির সময়কেই তুলে ধরেছেন। তাই ব্যক্তি প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেব-দ্বিজে ভক্তি কমতে লাগল। ফলে অন্নদামঙ্গলে শিবের দেব মহিমার আর কণাটুকুও রইল না। ব্যাসদেব অনায়াসে দেবতার প্রতিস্পর্ধি হয়ে দেখা দিলেন, বসুন্ধরাও অন্নদার পুজোয় কোন আগ্রহ না দেখিয়ে রতি সুখে ব্যস্ত, গৌরীর মুখেও দেখা গেল পতি নিন্দা ইত্যাদি ঘটনা - যা আগত আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে নারীচরিত্র বহুমাত্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে নারীর ভূমিকা, অবস্থান, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা— সবই একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে নারী একদিকে আদর্শ গৃহিণী ও পতিব্রতা, অন্যদিকে শক্তি ও মাতৃত্বের প্রতীক। দেবী অন্নদার মাধ্যমে নারীর দেবত্ব ও ক্ষমতার দিকটি ফুটে ওঠে, যা সমাজে নারীর গুরুত্বকে নির্দেশ করে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে নারীরা শুধু গৃহস্থালী জীবনের অংশ নয়, বরং কাহিনির অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানবী নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা সমাজের নিয়মে আবদ্ধ এবং পুরুষনির্ভর হলেও, ধৈর্য, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করে। কাব্যে তাদের দুঃখ, ত্যাগ ও সংগ্রামের চিত্র যেমন আছে, তেমনি দাম্পত্য প্রেম ও পারিবারিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকও প্রতিফলিত হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দেবী অন্নদা। তিনি শুধু পূজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন, বরং শক্তির প্রতীক। তার মাধ্যমে নারীকে একদিকে মাতৃমূর্তি, অন্যদিকে শক্তির আধার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তবে সার্বিক বিচারে বলা যায় যে মধ্যযুগের বাঙালি রমণীরা অবশ্যই শোষিত-বঞ্চিত-অবদমিত। তথাপি ভারতচন্দ্র যেহেতু মধ্যযুগের শেষ কবি এবং তারপর আধুনিক যুগের সূত্রপাত তাই তার কাব্যে প্রথম শোনা যায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর কণ্ঠস্বর যা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে কখনও শোনা যায়নি। তাই অন্নদামঙ্গল কাব্যে হরগৌরীর কথোপকথন অংশে দেখা যায় গৌরী শিবকে নিন্দা করার মধ্যে দিয়ে গৌরী নারী হিসেবে তার অবস্থানটি শিবকে ও সেই সঙ্গে পাঠককেও চিনিয়ে দেন। যদিও তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তথাকথিত পিতৃতন্ত্রের সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী নারী নিষ্পেষণের চিত্র উপস্থিত তথাপিও তার কাব্যে প্রথম নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ দেখা যায় - যা আসন্ন অষ্টাদশ শতকের সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে।

Reference:

১. https://stotram.co.in/wp-contetnt/uploads/pdfs/39/Annapurnaashtakam_bengali_PDF_files8369.html
২. নস্কর, সনৎকুমার; মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, রত্নাবলী- কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৯৩-১৯৪
৩. রায়, শ্রী ভারতচন্দ্র; অন্নদামঙ্গল, কৃষনগরের রাজবাটির মূলপুস্তক দৃষ্টে, কলিকাতা, ১৭৭৫ শকাব্দ, পৃ. ১৭৬
৪. তদেব, পৃ. ১৮৫
৫. তদেব, পৃ. ১৭৫
৬. তদেব, পৃ. ১৭৫
৭. তদেব, পৃ. ৫৪
৮. তদেব, পৃ. ৫৫
৯. তদেব, পৃ. ৫৬
১০. তদেব, পৃ. ১৩৯
১১. তদেব, পৃ. ১৪০
১২. তদেব, পৃ. ১৭১
১৩. তদেব, পৃ. ৭৬
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৬
১৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ; কবি ভারতচন্দ্র, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৯
১৬. রায়, শ্রী ভারতচন্দ্র; অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণনগরের রাজবাটির মূলপুস্তক দৃষ্টে, কলিকাতা, ১৭৭৫ শকাব্দ, পৃ. ৬৬
১৭. তদেব, পৃ. ৬৭
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রী সজনীকান্ত (সম্পাদক); ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 28
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

১৯. রায়, শ্রী ভারতচন্দ্র; অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণনগরের রাজবাটির মূলপুস্তক দৃষ্টে, কলিকাতা, ১৭৭৫ শকাব্দ, পৃ. ১৫৫
২০. তদেব, পৃ. ৭৯
২১. তদেব, পৃ. ১৬৫
২২. তদেব, পৃ. ১২
২৩. তদেব, পৃ. ১২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
রায় শ্রী ভারতচন্দ্র; অন্নদামঙ্গল, কৃষনগরের রাজবাটির মূলপুস্তক দৃষ্টে, কলিকাতা, ১৭৭৫ শকাব্দ

সহায়ক গ্রন্থ :
বসু শঙ্করীপ্রসাদ বসু; কবি ভারতচন্দ্র, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
নস্কর সনৎকুমার; মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, রত্নাবলী- কলকাতা, ১৯৯৫
চট্টোপাধ্যায় অমিয়ভূষণ; বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রী সজনীকান্ত (সম্পাদক); ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫
ভট্টাচার্য নির্মলেন্দু (সম্পাদনা); ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩